ISSN 2227-1635
**বাঙলা সাহিত্যিকী** ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

# জাকির তালুকদারঃ স্রোতের বিপরীতে নিঃসঙ্গ নাবিক

*রিজওয়ানা সুলতানা

**সারসংক্ষেপ:** ছোটগল্প সাহিত্যের নবীন ও জটিল মাধ্যম। সাম্প্রতিক সময়ে এই জটিল মাধ্যমকে যাঁরা মনন ও প্রজ্ঞা দিয়ে ঋদ্ধ করছেন, তাঁদের মধ্যে জাকির তালুকদার একটি বিশেষ নাম। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একটি নিজস্ব সাহিত্যিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। বিষয়বৈচিত্র্য, নতুন অনুষঙ্গের সচেতন ও পরিকল্পিত ব্যবহার, গল্পের বয়ানভঙ্গীতে অভিনবত্ব তাঁর ছোটগল্পের পরিসরকে অন্যদের থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে দিয়েছে। সময় ও সভ্যতার প্রবহমানতায় ব্যক্তি মানুষের অবস্থান, মানবজীবনের অতীত এবং বর্তমানের সংকটগুলোর তুলনা, শোষণের রূপ বদল, মানব অবচেতনে যৌথ চেতনা বিষয় সম্পর্কিত লেখকের ভাবনাগুলো গল্পে অভিনব মাত্রা পেয়েছে। প্রবন্ধটিতে লেখকের ছোটগল্পে স্বতন্ত্র ভাবনাসমূহ, বিষয়বৈচিত্র্য, নতুন অনুষঙ্গ ব্যবহার প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোকপাত এবং লেখকের গল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর গল্পভাবনায় মৌলিকত্ব ও প্রবণতাসমূহ চিহ্নিত করার প্রয়াস রয়েছে।

জাকির তালুকদার (২০ জানুয়ারি, ১৯৬৫) কথাসাহিত্যিক হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, অনুবাদ ও সম্পাদনাতেও তাঁর সৃষ্টি সম্ভার ঋদ্ধ। ছোটগল্পের বক্তব্য ও প্রকরণ শৈলীর সচেতন রসায়ন নিয়ে তাঁর সাহিত্যিক অগ্রযাত্রা যেখানে শিল্প এবং জীবন পরস্পরের কাছে দায়বদ্ধ। বিনোদন বা জনপ্রিয়তার জন্য নয়, জীবনের গভীরতা উপলব্ধি ও সমাজের ক্ষতসমূহের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস তাঁর সাহিত্যিকসত্তা এবং সাহিত্যচর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জাকির তালুকদারের জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা নাটোর শহরেই। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলো হলোঃ

*স্বপ্নযাত্রা কিংবা উদ্বাস্তুপুরাণ* (১৯৯৭)
*বিশ্বাসের আগুন* (২০০০)
*কন্যা ও জলকন্যা* (২০০৩)
*কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই* (২০০৬)
*রাজনৈতিক গল্প: হাভাতভূমি* (২০০৬)
*মাতৃহন্তা ও অন্যান্য* (২০০৭)
*The Uprooted Image* (২০০৮)
*গল্পসমগ্র*- ১ম খণ্ড (২০১০)
*যোজনগন্ধা* (২০১২)
*বাছাই গল্প* (২০১৩)
*গোরস্তানে জ্যোৎস্না* (২০১৪)
*নির্বাচিত গল্প* (২০১৬)
*বেহুলার দ্বিতীয় বাসর* (২০১৭)
*গল্পসমগ্র- ২য় খণ্ড* (২০২০)

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ

প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে জাকির তালুকদারের বিষয় ভাবনার স্বকীয়তা সম্পর্কিত আলোচনার জন্য ছোটগল্পে তাঁর প্রবণতাসমূহকে প্রতিনিধিত্ব করে সেই গল্পগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে । তাঁর গল্পে বিষয় ভাবনার ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী, মানবসভ্যতার অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন যাত্রা, সামষ্টিক কণ্ঠস্বর, ইসলামী ও হিন্দু মিথের ব্যবহারে অভিনবত্ব, রাজনীতির জটিল রূপ, এনজিও বিরোধী মনোভাব, অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্তমানকে মূল্যায়ন বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে।

জাকির তালুকদারের জীবনবোধ ও প্রকাশভঙ্গির ঋজুতা, বয়ানপদ্ধতিতে নির্লিপ্ততা, আড়ম্বরহীন সূচনা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার নির্ভীক প্রকাশের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছাত্রজীবনের প্রগতিশীল বাম রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা। একই কারণে বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে তিনি শুধু একক ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতা নয় বরং কোন কোন রাজনৈতিক দর্শনের বিপরীতে তাঁর মানসিক অবস্থান ও ধ্যান-ধারণাকে সুনিশ্চিত করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকে একেবারেই শিশুকালে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই স্মৃতি অপরিণত বয়সের। কিন্তু যৌবনে সর্বহারা, নক্‌শাল ও বাংলাভাইদের দৌরাত্ম ও নির্যাতনের অভিজ্ঞতা দগদগে, রক্তাক্ত। একইসাথে মৌলবাদের উত্থান, প্রসার ও থাবার বিস্তার কতটা সমাজ-মানুষকে অসহায় করে তোলে লেখক পরিণত বয়সে তার মুখোমুখি হয়েছেন। পেশায় চিকিৎসক হওয়ার কারণে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের গভীরে লেখক অনায়াসে প্রবেশ করতে পেরেছেন। তাঁর গল্পে এইসব বঞ্চিত, শোষিত, নিষ্পেষিতদের কণ্ঠস্বর বারংবার উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। তিনি গতানুগতিকতার বিপরীতে, স্বতন্ত্র পথে তাঁর ছোটগল্পের যাত্রাকে পরিচালিত করেছেন। চিরপরিচিত ছোটগল্পের যে ধারণা, জীবনের খণ্ড কোন আবেগ অনুভূতির অভিজ্ঞতাকে অখণ্ডতা দানই এর লক্ষ্য— সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ইতিহাস, ঐতিহ্য, মানবসভ্যতার ধারাবাহিকতার সামগ্রিকতায় মানুষের অবিচ্ছেদ্য অবস্থান, যূথবদ্ধ মানুষের অবচেতনে বর্তমান বিভিন্ন অনুভূতির পরম্পরাকে গল্পে আশ্চর্য দক্ষতায় তুলে ধরলেন।

*সোলেমান পয়গম্বরের দেয়াল*, *মাতৃহন্তা*', *একটি পুরুষতান্ত্রিক গল্প*, *কন্যা ও জলকন্যা* প্রভৃতি গল্পে মানুষের অবচেতনে রক্ষিত আদিম অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক অনুভূতির অনুরণন লক্ষ করা যায়। সমগ্র মানব জাতির একটি অভিন্ন যৌথ সত্তার অস্তিত্ব এবং সমকালীন বাস্তবতায় একক ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন সত্তার উপস্থিতির কারণ সোলেমান পয়গম্বরের দেয়াল' গল্পের শুরুতেই উল্লেখ করতে দেখা যায় এভাবে 'আমরা মানে আমি, জামিল এবং ফারুক। তিনজন তিনটে গোত্রের প্রতিনিধি। অর্থাৎ আমরা কোনো অবিভাজ্য সত্তা নই। তবে পরিস্থিতি আমাদের ভাবতে বাধ্য করেছে যে, আমরা আসলে এক অখণ্ড সত্তারই স্বাধীন উত্তরাধিকারী। ত্রিভুজের তিন বাহুর মতো।'[১] সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানবজাতির মুক্তির জন্য যেমন জীবনকে তুচ্ছ ভেবে কাজ করে গেছে কিছু মহান মানুষ, বিপরীত দিকে সভ্যতা-মানবতার অগ্রগতি রোধকল্পে ষড়যন্ত্রকারী কিছু সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিও যেন অনিবার্য বিধিলিপি। উক্ত গল্পে সমগ্র মানবজাতির শত্রু ইয়াজুজ মাজুজ জাতিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ করে রেখে গেছেন মহান বুজুর্গ ব্যক্তি সোলেমান পয়গম্বর। কিন্তু ইয়াজুজ মাজুজকে সেই দেয়াল অতিক্রম করতে সহায়তা করে মানুষের মধ্যকার কিছু স্বার্থপর ও লোলুপ মানুষরূপী অমানুষ। ইয়াজুজ মাজুজ মুক্তি পেয়ে একে একে ধ্বংস করে সৌহার্দ, গণতন্ত্র, মানবতাসহ যাবতীয় কল্যাণকর গুণাবলি। তবে গল্পের সবচেয়ে নাটকীয়

মোচড় দেখা যায় যারা মানবজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইয়াজুজ মাজুজকে সাহায্য করে এবং তাদের স্বাগতম জানাতে তোরণ নির্মাণ করে তারাই সর্বপ্রথম পদপিষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। বিশ্বাসঘাতকরা কারো বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না, তাদের কোন আশ্রয়ও থাকে না। তাঁর এই গল্পে ইয়াজুজ মাজুজের রূপে মৌলবাদী শক্তিকে এবং তাদের সমর্থনকারীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। *মাতৃহন্তা* গল্পেও যৌথসত্তা ও অবচেতনে রক্ষিত অতীত অভিজ্ঞতার অনুভূতি প্রকাশ করতে দেখা যায়। এই গল্পে নারীদের বটবৃক্ষ রোপণের পরে পুরুষরা বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয় এবং বিষণ্নতার কারণ জানতে চাওয়া হলে তারা জানায় 'জানি না। মনে নেই সেই স্মৃতি। শুধু জানি মর্মন্তুদ এক অতীত। মনে হয় পূর্বজন্মের কোনো পাপ, যা আমাদের স্মৃতিতে নেই। কিন্তু ঐ বটবৃক্ষ আমাদের জাতিস্মর বানাতে চায়।'[২]

পূর্বপুরুষ কর্তৃক সংঘটিত পাপ এবং তার ফলে সৃষ্ট পাপবোধ পরবর্তী প্রজন্ম অবচেতনে বয়ে নিয়ে চলেছে। *কন্যা ও জলকন্যা* গল্পেও অতীত স্মৃতির উন্মোচন ঘটে নাম না জানা যুবতীর নিজের অবচেতনের অন্ধকারে ডুব দিয়ে সত্যান্বেষণের মাধ্যমে। বিস্মৃতির অতলে সযত্নে রক্ষিত যৌথ অভিজ্ঞতার স্মৃতি মানুষ বয়ে চলে পুরুষের পর পুরুষ ধরে। অধিকাংশ গল্প ছোট কিন্তু গল্পের ক্যানভাস অতীত থেকে ভবিষ্যতে বিস্তৃত। একক ব্যক্তিমানুষের জীবনের ব্যাপ্তিকাল সামান্য হলেও দীর্ঘ মানব ইতিহাস ও সভ্যতার যাত্রায় উক্ত মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই তিনি মনে করেন মানুষ তার ভূমিকাটুকু পালন করে মারা যায় কিন্তু মানবযাত্রা অব্যাহত থাকে। একক ব্যক্তিমানুষের আপাত ক্ষুদ্র যাত্রা, মানব সভ্যতার দীর্ঘ এই অগ্রগমনকে সচল রাখে; রাখে অবিচ্ছিন্ন। তাই তাঁর গল্পে সমাজের তুচ্ছ মানুষগুলো আপন অস্তিত্ব নিয়ে প্রচণ্ডভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে।

জাকির তালুকদারের কিছু গল্পে কালেক্টিভ কনশাসনেসের বোধটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য তিনি কোন সুনির্দিষ্ট একক ব্যক্তি কর্তৃক গল্প বয়ানরীতির পরিবর্তে সামষ্টিক বয়ান ভঙ্গিকে প্রয়োগ করেছেন। তাই অনেক গল্পেই আমরা, তারা, নারীরা, রমণীরা, পুরুষরা, পুরুষদের, পুরুষকুল, যুবকদের, মহিলারা ইত্যাদি বহুবচনবাচক শব্দের ব্যবহার বারবার দেখা যায়। *সোলেমান পয়গম্বরের দেয়াল*, *মাতৃহন্তা*, *একটি পুরুষতান্ত্রিক গল্প*, *দিনযাপন* অথবা *উদ্বাস্তুপুরাণ*, *সুতানাগ* প্রভৃতি গল্পের বক্তব্য ও অনুভূতি কোনো ব্যক্তিমানুষের একক বোধজাত নয়। তাঁর গল্পে সামষ্টিক চেতনা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে বিধায় সমগ্র গ্রাম, গ্রামের সব নারী বা পুরুষের বক্তব্য সমবেতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:

ক. 'পুরুষদের রুদ্ধবাক হবার মূল কারণ, নারীরা কিন্তু বটবৃক্ষ রোপণের অনুমতি চায়নি বরং রোপণের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।'[৩]

খ. 'তখন রমণীরা বুঝে ফেলে পুরুষরা আজো ফিরবে না ঘরে।'[৪]

গ. 'পুরুষদের বিষণ্নতায় নারীরাও দগ্ধ হয়।'[৫]

*একটি পুরুষতান্ত্রিক গল্প* এখানেও এই বয়ানরীতির ব্যবহার পাঠকের মনোযোগের আলাদা ক্ষেত্র তৈরি করে। 'চুলোর আঁচে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে লাল চোখ নিয়ে পিঁড়ি পেতে বসে আছে রাঁধুনিরা।'[৬] এই গল্পের প্রায় পুরো আয়তন জুড়ে সামষ্টিক অভিব্যক্তি ও সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের বিবরণ আছে। একইভাবে *কন্যা ও জলকন্যা* গল্পে ইংরেজ বণিকদের কাছে তাঁতশিল্পীদের পরাজিত হওয়ার করুণ ইতিহাস সমবেত কণ্ঠস্বরে বর্ণিত হয়েছে। 'পুরুষরা পরাজিত। ভাষাহীন

দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয় রমণীদের। বেনের কাছ থেকে সম্ভ্রম ফিরিয়ে আনার মতো সংঘশক্তি-আত্মশক্তি তাদের নেই।'[৭] *পণ্যায়নের ইতিকথা* গল্পেও সমবেত কণ্ঠস্বরে শোষণ, বঞ্চনা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে দেখা যায়। এনজিও ব্যবসায়ীরা অসহায় এই গোষ্ঠীকে সঙ্ বানিয়ে বিদেশি দাতাদের কাছ থেকে তাদের জীবনমানের উন্নয়নের নাটক সাজিয়ে অনুদান ও সহায়তা মঞ্জুর করিয়ে নেয়। সেই অসহায় গোষ্ঠীর নামে মঞ্জুরীকৃত টাকা মন্ত্রী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও বিত্ত বৃদ্ধিতে কাজে লাগায় সেই চিত্র গল্পটিতে বলা হয়েছে। নাটকের অংশ হিসেবে বিদেশি দাতাগোষ্ঠীর সামনে তাদের জন্য একবেলা উপাদেয় সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করে প্রমাণ করার চেষ্টা যে এই সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠী এনজিওর প্রচেষ্টায় কত উন্নত জীবন লাভ করেছে। কিন্তু গল্পের শেষে প্রতারিত গোষ্ঠীর সমবেত প্রতিবাদ গোষ্ঠীগত উচ্চারণে পরিণত হয়। তাদের সমবেত প্রতিরোধের আওয়াজ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এভাবে:

> দূরের টেবিল থেকে ভেসে আসে একটা নারীকণ্ঠ– আজ আমাদের উপোস। ধর্মে নিষেধ আছে খাওয়া। আজ যে খাবে, সে যেন চিমটি কাটবে নিজের পেটের ভেতরে থাকা ছেলেকে।
> সঙ্গে সঙ্গে আরেক টেবিল থেকে প্রতিধ্বনি জাগে একই বক্তব্যের। প্রতিটি শব্দ পরের পর নিখুঁতভাবে সাজানো। কোনো শব্দ আগে-পিছে হয় না। একই থাকে তাল-লয়। ...
> একের পর এক টেবিল থেকে পুনরাবৃত্তি ভেসে আসতে থাকে। একই বাক্য পরপর সাজানো।[৮]

তাদের প্রত্যেকের প্রতিবাদী চেতনা অভিন্ন স্বররূপে স্ফূরিত হয়ে মিশে যায় আকাশে বাতাসে। গল্পগুলোতে সামষ্টিক কণ্ঠস্বর গ্রিক ট্র্যাজিডির কোরাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। *সুতানাগ* গল্পটিতেও সমবেত মানুষের মানবেতর জীবনযাপন ও অবাধ মুক্তবাণিজ্যের বিশ্বে দরিদ্র মানুষগুলো কীভাবে প্রতারিত হয়ে দরিদ্রতর জীবনের দিকে ধাবিত হয় তা চোখে আঙুল দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিলাসদ্রব্যের চাকচিক্যের মোহে ফেলে গরীবদের সর্বস্ব নতুন করে শুষে নিচ্ছে। আর দরিদ্র জনগণ যখন চক্রান্ত অনুধাবন করতে পারে তখন করার মত কিছুই থাকে না। কারণ তারা উপলব্ধি করে এনজিও এবং কোম্পানিগুলো তাদের শেকড় দরিদ্র স্বজাতিদের সহায়তায় অনেক গভীরে প্রবেশ করিয়েছে যার মূল উৎপাটন করা অসম্ভব। গল্পটিতে সমস্যার শুরু গ্রামের সকল নারীকে নিয়ে। সমাধানের জন্য গ্রামের সব পুরুষ উদ্যোগী হয় এবং চরমভাবে পরাজিত হয়। পরিশেষে সমগ্র গ্রামের পুরুষের ব্যর্থতার গ্লানি গল্পটিকে করুণরসে সিক্ত করে যার অনুভূতি পাঠক মনকেও বিষাদগ্রস্ত করে । সর্বোপরি গল্পের উপলব্ধিটি শুধু উক্ত গ্রামের জন্য নয় সমগ্র দেশের জন্য প্রযোজ্য। বেহুলার বাসরঘরে সুতানাগ সাপ যেভাবে প্রবেশ করেছিল বেনিয়া কোম্পানিগুলো একইভাবে সাহায্যের হাত নামক শোষণের হাতিয়ার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গভীরে প্রবেশ করায়। দাতাগোষ্ঠীর সেই অক্টোপাশের হাত থেকে কারও মুক্তি নেই।

তাঁর কিছু গল্পে দুইটি কাহিনি দেখা যায়। তবে উভয় কাহিনির উদ্দিষ্ট বিন্দু এক ও অভিন্ন। তাঁর গল্পের কাহিনিকে দুইটি পরস্পরছেদি বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করা যায় যেখানে স্বতন্ত্র দুই কাহিনির অভিন্ন সাধারণ অবিচ্ছেদ্য অংশ রয়েছে। এই অবিচ্ছেদ্য অংশই পৃথক সময়, পৃথক চরিত্র ও সমাজ বাস্তবতাকে যৌক্তিক শৃঙ্খলায় অন্বিত করে। *স্বপ্নযাত্রা কিংবা উদ্বাস্তুপুরাণ*,

*মাতৃহন্তা*, *একটি পুরুষতান্ত্রিক গল্প*, *কন্যা ও জলকন্যা*, *দিনযাপন অথবা মৃতসুন্দরীর গল্প*, *পুরুষ*, *তাহাদের কথাসহ* আরও অনেক গল্পেই একাধিক কাহিনির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। *স্বপ্নযাত্রা কিংবা উদ্বাস্তুপুরাণ* গল্পে ঐতিহাসিক আসহাবে ক্বাহাফ, সাতজন যুবক যারা অত্যাচারী বিধর্মী শাসকের হাত থেকে নিজেদের ও ইসলাম ধর্মকে বাঁচাতে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় দীর্ঘ নিদ্রার আশ্রয় নেয় তাদের কাহিনির পাশাপাশি সমকালীন গোবিন্দর পরিবারের ছিন্নমূল হওয়ার ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী কাহিনির সঙ্গে হিন্দু পরিবারের রামরাজ্যে গমনের স্বপ্ন ও যাওয়ার পরে স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতাকে লেখক একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। একদিকে ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক ঘটনা যার চরিত্ররা মুসলিম সাতজন যুবক এবং সময় হাজার বছরেরও বেশি পূর্বের। অন্যদিকে গোবিন্দর পরিবারের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাতজন নারী যাদের অবস্থান বর্তমান সময়ে তাদেরকে নিয়ে ঘটনা আবর্তিত হলেও উভয় ঘটনার যোগসূত্র উদ্বাস্তুচেতনার অসহায়ত্বে একীভূত হয়েছে। লিঙ্গগত, ধর্মগত, সময়গত সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও অন্তর্নিহিতভাবে ও করুণরসে কাহিনি দুইটি একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। গল্পে নিরাপদ আশ্রয়ের আকুতি স্থান, কাল, লিঙ্গ, ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনীন এক পরম চাওয়া। *কন্যা ও জলকন্যা* গল্পে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সন্তানহীনা যুবতীর পিতৃগৃহে ফেরত পাঠানোর অবমাননাকর ঘটনার পাশাপাশি দুইশত বছরের অধিক সময় পূর্বেকার ইংরেজ বেনিয়াদের নোংরা কৌশলের শিকার হয়ে দেশীয় তাঁতশিল্পের ধ্বংস প্রক্রিয়ার হৃদয়বিদারক তিক্ত ইতিহাসকে একই বিন্দুতে সংস্থাপিত করা হয়েছে। *মাতৃহন্তা* গল্পেও অনুরূপ উত্তরাঞ্চলের একটি পরগণার নারীদের বটবৃক্ষ রোপণের ঘটনার প্রেক্ষিতে অতীতের এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতাপূর্ণ অতিলৌকিক কাহিনির উন্মোচন ঘটে। দুইটি কাহিনি আলাদা সময় ও পরিবেশের হলেও উভয় কাহিনি একত্রিত হয়ে গল্পটিকে পূর্ণতা দিয়েছে।

জাকির তালুকদারের কিছু গল্পে অনেক গল্পের ইঙ্গিত সম্মিলিতভাবে গ্রথিত হয়ে একক গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে যাকে অনেকটা মুক্তার মালার সঙ্গে তুলনা করা যায়। *দিনযাপন অথবা মৃত সুন্দরীর গল্প*তে অনেক গল্পের ইঙ্গিতবহ সূচনাপর্ব দেখা যায়। এই গল্পে প্রায় দেড়পৃষ্ঠাব্যাপী সূচনাপর্ব— যা একটি মাত্র বাক্য নিয়ে গঠিত হয়েছে। অনেক গল্পের সম্ভবনাময় ও ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যাংশের সমষ্টি সূচনা বাক্যটিকে স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী উপস্থাপন পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনার দাবি রাখে। গল্পটির সূচনা বাক্যের খণ্ডিত অংশ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হল:

> ... তাই অকৃত্রিম সৌন্দর্য দেখতে হলে দেখতে হবে মৃতসুন্দরীকে– একথা আমরা মেনে নিয়েছিলাম, আমাদের অন্তরে গেঁথে নিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু বছরের পর বছর আমরা মৃত সুন্দরী কিংবা সুন্দরীর মৃত মুখশ্রী দর্শন পাই না, ফলে আমরা আকুল হয়ে উঠি, আর আমাদের আকুলতা এক সময় আমাদের অন্যমনস্ক করে তোলে– যা আমাদের প্রেমিকাদের দৃষ্টি এড়ায় না এবং তাদের কাছে আমরা একসময় বাধ্য হই আমাদের মনস্কামনার কথা প্রকাশ করতে; তখন দোলা বলে যে– আমি তাহলে মরি...।[৯]

কথাসাহিত্যে স্থান ও কাল নির্বিশেষে নারী একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। জাকির তালুকদারের গল্পে নারী ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রেম বা যৌন অনুষঙ্গ নয় বরং নারী তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ব নিয়ে যৌক্তিকভাবে অত্যন্ত পরিমিত পরিসরে আবশ্যক স্থানটুকু দখল করেছে। নারীর ব্যক্তিক উপস্থাপনকে ছাপিয়ে দেহসৌষ্ঠব কখনোই গল্পে প্রাধান্য পায়নি। সুন্দরী নারী কেন্দ্রিক প্রচলিত রোমান্টিক গল্পের প্রথাকে তিনি সচেতনভাবে বর্জন করেছেন। *সোলেমান পয়গম্বরের*

*দেয়াল, শত্রুপক্ষ, ক্রসফায়ারের আগে* প্রভৃতি গল্পে উল্লেখ করার মত কোন নারী চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায় না কারণ এই গল্পগুলোর কাহিনির অগ্রগতি ও পরিণতিতে নারী চরিত্র আলাদা কোন ভূমিকা দাবি করে না। আবার *দিনযাপন কিংবা মৃতসুন্দরীর* গল্পতে ফিরোজাকে কেন্দ্র করে সকল ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ এবং প্রকাশ ঘটেছে। গল্পটিতে ফিরোজা শুধু সমাজসত্যকেই উপলব্ধি করে না বরং জন্মদাতা পিতামাতার শোষক রূপও তার সামনে রূঢ়-কঠিন বাস্তবতায় ধরা দেয়। এনজিও নামক প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র মোচনের স্বপ্ন দেখানোর অন্তরালে নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া অসহায় মানুষদেরকে শোষণের নতুন কৌশলকে আড়ম্বরহীন স্বাভাবিকতায় লেখক বর্ণনা করেছেন। গল্পটিতে এনজিওকর্মীদের দেহ-মন-যৌবনের রস নিংড়ানো একঘেয়ে ক্লান্তিকর যে জীবনচিত্র প্রকাশিত হয়েছে তার কেন্দ্রে ফিরোজার অবস্থান। বয়সে তরুণী হওয়া সত্ত্বেও যৌবনের জৌলুস বিবর্জিত, পরিবার ও নিজ জীবনের ভারবাহী পশুর সমতুল্য জীবন ফিরোজার, যার আঁচ পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। ফিরোজার রুক্ষ-বৈচিত্র্যহীন-ক্লান্তিতে ভরা প্রাত্যহিক দিনযাপন পাঠকচিত্তেও সংক্রমিত হয় । অন্য আরও কিছু গল্প যেমন *পণ্যায়ণের ইতিকথা, সুতানাগ* প্রভৃতিতে লেখকের এনজিও কনসেপ্ট বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেতে দেখা যায়। *একটি পুরুষতান্ত্রিক গল্পে* সম্মিলিত নারীর যৌথ প্রতিবাদী রূপ ধরা পড়ে। আত্মসম্মান সচেতন এবং কোন প্রকার ভয়, প্রলোভন বা অত্যাচারে তারা ভেঙে পড়ে না। তবে একক নারী নয় যূথবদ্ধ নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে গল্পটিতে। *বিশ্বাসের আগুন* গল্পে মাঝবয়সী পরিশ্রমী জমিলা চরিত্রকে পাওয়া যায়। সে মঙ্গাপীড়িত উত্তরবঙ্গের খেটে খাওয়া একেবারেই প্রান্তিকবাসী নারীর প্রতীক। সে অলস ধর্মভীরু স্বামীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব বিনা প্রতিবাদে বহন করে চলেছে। *মনকুসুমকাহিনী* গল্পে অবস্থাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি জয়নালের তরুণী স্ত্রী কুসুম। কুসুমের স্বামীর দোকানের যুবক কর্মচারী মিন্টুর সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া এবং সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে মিন্টুকে স্বামী হিসাবে পাওয়ার পরেই গল্পের আসল দ্বন্দ্বের অবতারণা ঘটে। জয়নালের পুনরায় বিবাহ করা এবং কুসুমের চেয়ে কমবয়সী স্ত্রীর প্রতি জয়নালের আদর-সোহাগ কুসুমের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেই জায়গাতেই লেখকের মূল ফোকাস। তরুণী নতুন বৌয়ের প্রতি সাবেক স্বামীর ভালবাসা দেখে ঈর্ষান্বিত কুসুম ঘুমের মধ্যে বলে চলে, 'মাগি আমার সংসার ছাড়খার করতে আসিছিস! ... যদি তোর নাক আমি বঁটি দিয়া না কাটতে পারি তো আমি জয়নাল মিয়ার বউ কুসুমই না।'[১০] এই গল্পে নারীর জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস যা বোধের অগম্য হয়ত অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ং সেই নারীও তা জানে না– সেই অন্ধকার সর্পিল ক্ষেত্রটিতে লেখক দৃষ্টি ফেলেছেন। অন্যদিকে *পুরুষ* গল্পে কুসুম নামক নারী চরিত্র স্বামীর যৌতুকের পাওনা মিটাতে এবং মুক্তিযোদ্ধা বাবার স্বামীপক্ষের সামনে দেওয়া কথার সম্মান রাখতে পতিতায় পরিণত হয়। কোমল চরিত্রের নারী কুসুম একজোড়া কানের দুল ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য খুন করতেও দ্বিধা করে না। বিভিন্ন গল্পে টাইপ বা ছকেবাঁধা নারীচরিত্র দেখা যায় না বরং বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা নতুন নতুন রূপে নিজস্বতায় উপস্থাপিত হয়েছে।

জাকির তালুকদার নারী বা পুরুষ কেন্দ্রিক কাহিনি আশ্রয়ী গল্পের পরিবর্তে কাহিনির অনিবার্যতায় চরিত্রকে স্থাপন করেছেন। তবে *আজগর আলির হিসাববিজ্ঞান* গল্পের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল যে মনস্তাত্ত্বিক তাড়না তার গভীরে ছিল প্রত্যক্ষ করা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদপুর বাজারের দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত বৃদ্ধ দোকানি। কিন্তু তিনি সেই দোকানিকে নয় বরং তার মত

দরিদ্র জনগণের দুরবস্থার অন্তর্নিহিত কারণ ও মর্মজ্বালাকে ধারণ করেছেন আসগর আলির প্রতীকে। আসগর আলি কোন ব্যক্তি নয় বরং সহায়-সম্বলহীন মানুষের অস্থিচর্মসর্বস্ব প্রতিনিধি যারা নিরন্ন কিন্তু জীবনতৃষ্ণায় ব্যাকুল। *অন্ত্যেষ্টিযাত্রা* গল্পে মুক্তিযোদ্ধা শওকত আলির মৃত্যু পরবর্তী মুক্তিযোদ্ধা প্রমাণের জটিলতা ও সরকারী নিয়মনীতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে মুক্তিযোদ্ধা শওকত আলি ব্যক্তিটির সমস্যা বা বঞ্চনাকে তুলে ধরা নয়, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনা, প্রত্যাশা-প্রাপ্তির বৈষম্য, অবহেলার চিত্র ,তাদের অস্তিত্বের সংকট এগুলোর ভাষারূপ দান করাই মুখ্য লক্ষ্য । কাজেই ব্যক্তির সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষার চেয়ে কোন বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠী অথবা সামষ্টিক মানুষের বার্তা উত্থাপন করা আলোচ্য লেখকের গল্পের প্রবণতা বলে প্রতীয়মান হয়। *পুরুষ* গল্পটিতে পুরুষদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে ধরার চেষ্টা দেখা যায়। তাদের আসল চাওয়া কী তা-ই শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাও জানে না আর নারীর পক্ষে তা বোঝা আরও দুরূহ। তাই 'শত শত, বলা চলে হাজার হাজার পুরুষ-ঘাঁটা শবনম মাসি হতভম্ব চোখে আমজাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। পুরুষ জাতকে চিনতে পারা একজীবনে কোনো নারীর পক্ষেই বোধহয় সম্ভব নয়!'[১১]

প্রেম ও যৌনতা তাঁর গল্পে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিতে পারেনি। কাহিনির অনিবার্যতায় অল্প কিছু গল্পে প্রেম ও যৌনতা স্থান পেয়েছে। তবে তা লেখকের বর্ণনায় একদম সাদামাটা ও বৈচিত্র্যহীন ঢঙে উপস্থাপিত হয়েছে। *তাহাদের কথা* গল্পে যৌনতার সামান্য প্রকাশ যা মানবজীবনের জৈবিক নিয়মেরই বহিঃপ্রকাশ। গল্পের খাতিরে আলাদা কোন পরিচর্যা করা হয়নি। *অনিশ্চিত যাত্রার আগের রাত* গল্পেও অতীত প্রেমের স্মৃতি আছে, আছে যৌনতার আভাস যা বর্তমান রূঢ় বাস্তবতার চাপে দল মেলার সুযোগই পায় না। *পুরুষ* গল্পে পতিতালয়ে কুসুমের অবস্থান এবং যৌন ব্যবসা শুরুর কথা থাকলেও তিনি কাহিনিকে এগিয়ে নিয়েছেন চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে, পুরুষের দ্বান্দ্বিক আচরণের দিকে, যার রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হয় না। *যোজনগন্ধা* গল্পে মালতির সঙ্গে কবি স্বভাবের সুবাস যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কাব্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। *এক বর্ষাসকালের প্রেমকাহিনী* গল্পে কিছুটা যৌনতার বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে গল্পের কার্যকারণসূত্রে বর্ণনাটুকু যৌক্তিকতার মাত্রাকে অতিক্রম করেনি।

গ্রিক ও ভারতীয় মিথের গতানুগতিক প্রয়োগের সমান্তরালে তিনি মুসলিম মিথের সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার সবচেয়ে ব্যতিক্রমী, সাহসী ও অভিনব পদক্ষেপ মুসলিম মিথের ব্যবহার। এ সম্পর্কে লেখক স্বয়ং *গল্পের জার্নাল* গ্রন্থে বলেছেন 'বাংলাদেশের মূলধারার সাহিত্যে প্রথম ইসলামি মিথ বা অনুষঙ্গ ব্যবহারের পথিকৃৎ হবার বাসনা নিয়ে নয়। বরং ইসলামি মিথকে কেন্দ্রে রেখে যে একটি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক গল্প রচনা করা সম্ভব, তা করে দেখানোর জন্যই। চ্যালেঞ্জটা সত্যিই বড়।'[১২]

তিনি চ্যালেঞ্জটা নিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন। তবে কাজটা শুধু ব্যতিক্রমীই নয় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ মুসলিম মিথের ব্যবহার যেহেতু অপ্রচলিত বিষয় কাজেই ভারসাম্যের ব্যত্যয় ঘটলেই মৌলবাদী বা ইসলামবিরোধী তকমা লেগে যাওয়ার সংশয়ে লেখককে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়েছে। গ্রিক বা ভারতীয় মিথের ব্যবহার তিনি বর্জন করেননি বরং মুসলিম মিথের সংযোজন ঘটিয়ে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রকে আরও ঋদ্ধ ও সম্প্রসারিত করেছেন। *সোলেমান পয়গম্বরের দেয়াল*, *স্বপ্নযাত্রা কিংবা উদ্বাস্তুপুরাণ*, *বিশ্বাসের আগুন*, *তাহাদের কথা*, *ক্রসফায়ারের*

*আগে*, *পুরুষ* প্রভৃতি গল্পে বর্তমান সময়ের সমস্যার প্রেক্ষাপটে ইসলামি মিথের ব্যবহার ও যৌক্তিকতাকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি সমন্বয় করে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু আলোচিত লেখক ইসলামের অতীত ঐতিহ্যে অবগাহন করে শিহরিত হয়ে আবেগঘন কাহিনি নির্ভর গল্প লেখায় কখনোই আগ্রহী ছিলেন না। বরং সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার অবস্থান ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী গল্পে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। *স্বপ্নযাত্রা কিংবা উদ্বাস্তুপুরাণ* এবং *ক্রসফায়ারের আগে* গল্পে আসহাবে ক্বাহাফের ঘটনা ও চেতনাকে স্মরণ করা হয়েছে। শাসকশ্রেণির অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রত্যয় আসহাবে ক্বাহাফ প্রতীকে প্রকাশ পেয়েছে। ইসলামি ধর্মীয় বিশ্বাস যে কোরআন শরীফ কখনো আগুনে পোড়ে না– সেই ধর্মীয় অনুভূতিকে অবলম্বন করে *বিশ্বাসের আগুন* গল্পটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। ধার্মিক লেহাজউদ্দিন শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে গিয়ে ধর্ম অবমাননার দায়ে শাস্তির মুখোমুখি হয়। *তাহাদের কথা* গল্পেও পুরুষদের দাঁড়ি রাখা বিষয়ক ইসলামি মিথকে প্রয়োগ করা হয়েছে। *পুরুষ* গল্পে কুলসুম যৌতুকের জন্য কানের দুল জোগাড় করতে গিয়ে বাচ্চা মেয়েকে হত্যা করে এবং তার ধর্মীয় বিশ্বাস 'তুইতো এখন ইব্রাহীম নবীর কোলে বস্যা বেহেস্তের মেওয়া খাচ্চু।'[১৩] আলোচ্য লেখক ইসলামের বিভিন্ন ঘটনা, মিথকে কাহিনির প্রাসঙ্গিকতায় ব্যবহার করলেও কোন ধর্মীয় সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামীকে গল্পে স্থান দেননি। লেখকের উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী যেমন ধর্মকে ব্যবহার করে স্বার্থসিদ্ধিকারীদের নগ্ন চেহারাকে প্রকাশ করেছে তেমনি ধর্মীয় অনুষঙ্গ বর্তমান সময়ের সংকটকেও অনুধাবনে সহায়তা করেছে। *সোলেমান পয়গম্বরের দেয়াল* এবং *স্বপ্নযাত্রা কিংবা উদ্বাস্তুপুরাণ* গল্প দুইটি তাঁর ইসলামি মিথ প্রয়োগের সফল ও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। ইসলামি মিথের পাশাপাশি তিনি অন্যান্য মিথকেও ব্যবহার করেছেন 'যেমন যীশু সকল মানুষের পাপ নিজে গ্রহণ করেছিলেন।'[১৪]

হিন্দু মিথকে আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে সমস্যার স্বরূপ অনুধাবনের যথার্থ উপকরণ হিসাবে গল্পে ব্যবহার করেছেন। *বেহুলার দ্বিতীয় বাসর*, *সুতানাগ*, *সত্যকাম*, *যোজনগন্ধা*, *শক্রু সম্পত্তি* গল্পে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনির পরিকল্পিত ও আধুনিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । *বেহুলার দ্বিতীয় বাসর* ও *সুতানাগ* গল্প দুইটির মূল চেতনা মনসামঙ্গল থেকে নেওয়া। 'বেহুলার দ্বিতীয় বাসর' গল্পে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। বেহুলা জীবনবাজি রেখে স্বামী লখিন্দরকে যমালয় থেকে ফিরিয়ে আনার পরেও স্বামীর কাছে অসতীরূপে প্রতীয়মান হয়। স্বামীর জন্য অসাধ্য সাধন করা, সতী বেহুলা শুধুই স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য কামার্ত দেবতাদের সামনে নৃত্য প্রদর্শন করা নারীর জন্য কতখানি অসম্মানের সেই বিষয়টি নবজীবনপ্রাপ্ত লখিন্দর অনুধাবন করতে না পারলেও লেখক উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বেহুলার অনন্ত প্রচেষ্টায় স্বামী লখিন্দর নবজীবন লাভ করার পরে বাসর রাতে স্বামী বেহুলাকে উপহার দেয় একরাশ সন্দেহ এবং বলে 'তুমি অসতী।'[১৫] পুরুষতান্ত্রিক আচরণের নগ্ন রূপ লখিন্দরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে *সুতানাগ* গল্পে বহুজাতিক ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর ভূমিকাকে দরিদ্রজনগণের জীবনে সুতানাগের সাথে তুলনা করা হয়েছে। লোহার বাসরঘর বানিয়ে চাঁদ সওদাগর মনসার কোপ থেকে ছেলে লখিন্দরকে রক্ষা করাতে পারেনি। তেমনি বহুজাতিক কোম্পানির বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়া অসহায় সহজ-সরল গ্রামীণ জনগণের পক্ষেও অসম্ভব। *শক্রু সম্পত্তি* গল্পে *মহাভারত* গ্রন্থের দ্রৌপদীর কাহিনির সঙ্গে জুয়াড়ি বৈকুণ্ঠ স্ত্রী

ইন্দুবালাকে বাজি ধরে আরেক জুয়াড়ি সুধীরের হাতে তুলে দেওয়ার ঘটনাকে তুলনা করতে দেখা যায়। তবে পার্থক্যটা হল *মহাভারতে*র দুর্যোধন কৃষ্ণের আশীর্বাদপুষ্ট দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে সমর্থ হয় না কিন্তু মানবী ইন্দুবালার শাড়ির দৈর্ঘ্য অসীম না হওয়ায় 'কাজেই তা খুলতে সুধীর কামারের কয়েকটা হ্যাঁচকা টানের বেশি লাগেনি।'[১৬] *সত্যকাম* গল্পটিতে উপনিষদের জবালা নামক একজন পতিতাপুত্রের গুরুগৃহে জ্ঞান অর্জনে যাওয়া ও সেখানে সত্য পরিচয় তুলে ধরার ঘটনাকে স্মরণে রেখে লেখকের নিজ জীবনে কলিকাতার সোনাগাছি পতিতালয় ভ্রমণের নিষ্ঠুর কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতার এক জটিল রসায়ন ঘটিয়েছেন। আবহমানকাল ধরে সমাজে নারীদেরকে পুরুষরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এসেছে। আবার ধর্ম ও সমাজ রসাতলে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে তারাই নারীর উপরই খড়গহস্ত হয়ে এসেছে। পুরুষদের এই দ্বিমুখী দ্বান্দ্বিক আচরণ গল্পে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে । গল্পটির নামকরণ ও অন্তর্লীন ভাবকে ধারণ করার জন্য হিন্দু পৌরাণিক অনুষঙ্গ *সত্যকাম* যথোপযুক্ত এবং এর মাধ্যমে সমাজের প্রতি লেখকের কটাক্ষ তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। *যোজনগন্ধা* গল্পটিতেও সমাজ ও পরিবারের অন্ধকার পঙ্কিলতাপূর্ণ দুর্গন্ধময় দিকটিকে চিহ্নিত করার স্বভাবসুলভ প্রবণতা দেখা যায়। এখানেও পৌরাণিক নারী চরিত্র যোজনগন্ধার নামানুসারে গল্পটির নামকরণ করা হয়েছে। গল্পটির নামকরণের পিছনে *মহাভারতে* যে পৌরাণিক কাহিনী লিপিবদ্ধ সেখানে পরাশর মুনি কর্তৃক মৎস্যগন্ধা পরবর্তী সময়ে যোজনগন্ধা তথা নারীকে ভোগ করার অপমানজনক ইতিহাস রয়েছে। নারীর হাজার হাজার বছরের ধারাবাহিক অপমান ও অসম্মানের সম্প্রসারিত কাহন *যোজনগন্ধা* গল্প। তবে *মহাভারতে* পরাশর মুনি মৎস্যগন্ধাকে ভোগ করার পরে বর দান করে শরীরে মাছের গন্ধের পরিবর্তে সুগন্ধ দান করেন। গল্পের মালতিকে সুবাস ভোগ করার পরে তার ভাগ্যও পরিবর্তিত হয়ে যায়, সে পতিতায় পরিণত হয়। মালতি পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়– সমাজ ও পরিবার তাকে বাধ্য করে। লেখক বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষঙ্গকে গল্পে ব্যবহার করে অতীতের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়কে মূল্যায়ন করেছেন।

ইসলামী-হিন্দু মিথের পাশাপাশি তিনি প্রচলিত রূপকথা, উপকথা, গীতিকা, পৌরাণিক কাহিনির নির্যাস ও প্রকরণ গল্পে প্রয়োগ করেছেন। *মাতৃহন্তা* গল্পে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, যক্ষ-যক্ষী, ঘুঁটেবুড়ি চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। *পুরুষ* গল্পে মৈমনসিংহ গীতিকা থেকে সংক্ষেপে আখ্যান তুলে ধরার কথা উল্লেখ আছে। *বালকের চন্দ্রযান* গল্পে চলনবিল অঞ্চলে প্রচলিত আঁধার রাতে তেল ফুরিয়ে গেলে ছেলের পথ প্রদর্শনের জন্য মা নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া নিয়ে প্রচলিত কিংবদন্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এই গল্পে শুকপাখির কাছ থেকে মায়ের প্রাণ ফিরিয়ে আনার উপায় জানতে পারে। বাস্তবতার সাথে রূপকথার অনুষঙ্গ ব্যবহার করে বিষয়কে যথার্থভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর বিষয় ভাবনার অভিনবত্ব এবং ভাবনাকে প্রকাশ করার জন্য এই অনুষঙ্গের ব্যবহার ব্যতিক্রমী ও অত্যন্ত আকর্ষণীয় কৌশল।

জাকির তালুকদার গল্পে যেমন সমসাময়িক বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন একই সাথে ঐতিহাসিক বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ ধর্ম নয় ধর্মব্যবসায়ীদেরকে লেখার মাধ্যমে আক্রমণ করেছিলেন। আলোচ্য লেখকের গল্পে দেখা যায় ধর্মের ছায়াতলে আসীন ব্যক্তিদের মানবীয় দুর্বলতাগুলো তুলে ধরে তাদের মেকি অতিলৌকিক অবস্থান থেকে সমাজের সাধারণ মানুষের কাতারে সামিল করতে। তিনি ধর্মীয় মৌলবাদের ঘোর বিরোধী। ধর্মকে

ফায়দা হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত করা যেমন অপরাধ তেমনি রাজনীতিকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করাও অপরাধ। রাজনৈতিক নেতাদের আপাত মোলায়েম ফেরেশতার মতো চেহারার অন্তরালে গজার মাছের মতো স্বজাতিখেকো রূপ বা বামরাজনীতির একসময়ের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে মিশে যাওয়ার প্রত্যয় কীভাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত হয় সেই সত্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গল্পে। তিনি অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন লেখক এবং ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকায় নেতাদের নীতিবাদী আদর্শরূপ যেমন কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন আবার হিংস্র, প্রতারক রূপও দেখেছেন। তাঁর গল্পে আদর্শবাদী নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি আছে, আছে সমাজ ও মানুষকে নিয়ে ব্যবসা করা নীতিহীন নেতা। সর্বহারা ও বাংলা ভাইদের উত্থান এবং তার পিছনে ক্রিয়াশীল রাজনীতি, এনজিও কার্যক্রমের সমাজ উন্নয়নের মেকি চিত্র, এনজিওকর্মীদের মানবেতর জীবনযাপন, নারী-পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, ওয়ান ইলেভেনের প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনি কর্তৃক আদর্শ রাজনৈতিক কর্মীদের পাশবিক নির্যাতনের বর্ণনা সবকিছু তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণই সাহিত্যিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এবং গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি মুক্তিযুদ্ধকে খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। অরাজনৈতিক ও নির্মোহ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের করুণ জীবনযাপন ও অসহায়ত্ব যেমন খুঁজে পেয়েছেন তেমনি যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সহায়তাকারীরা কীভাবে সমাজে সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি করেছে সেই কৌশলকেও উপলব্ধি করেছেন। তারাই আবার সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে সেই সত্যও গল্পে বয়ান করা হয়েছে। অনেক গল্পে সাম্প্রদায়িকতার চরম রূপকে তুলে ধরেছেন। যৌনকর্মীদের অসহায়ত্ব ও পেশার আড়ালে তাদের মানবিক অবস্থানকে তিনি অনুভব করেছেন। বেশ কিছু গল্পে যৌনকর্মীদের জীবনযাপন, কর্মকাণ্ড, পেশা বেছে নেওয়ার প্রেক্ষাপট গুরুত্ব পেয়েছে। গল্পগুলোতে যৌনকর্মীদের প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ দেখা যায়।

জাকির তালুকদারের অনেক গল্পের পটভূমি গ্রাম, খুব কম সংখ্যক গল্পে শহরকেন্দ্রিকতা দেখা যায়। তাঁর গল্পে উত্তরবঙ্গ জনপদের মানুষ ও তাদের মঙ্গাকবলিত জীবনের দুর্বিষহ জীবনালেখ্য স্থান পেয়েছে। জন্ম ও কর্মসূত্রে লেখক উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের জীবনচর্চার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই অত্যন্ত মমতায় উক্ত অঞ্চলের সুখ-দুঃখ, জীবনাচরণ, ঐতিহ্য, মিথ এবং আঞ্চলিক ভাষাকে গল্পে ধারণ করেছেন। চলনবিল কেন্দ্রিক যে জনবসতি ও জীবনাচরণ বেশ কয়েকটি গল্পের বুননে তিনি সেগুলোকে মিশিয়ে দিয়েছেন। *কন্যা ও জলকন্যা* গল্পটিতে চলনবিল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ইংরেজ আগমন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এক ঐতিহাসিক যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। *দাস পরম্পরা*, *কদমচিলা*, *অন্ত্যেষ্টিযাত্রা*, *কন্যা ও জলকন্যা*, *আজগর আলির হিসাববিজ্ঞান*, *যোজনগন্ধা* প্রভৃতি গল্পে নাটোর, গাইবান্ধা, রাজশাহীসহ উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক সংলাপের সাবলীল ব্যবহার দেখা যায়। যেমন:

১. 'তাঁই ভিতরে আছে।'[১৭]
২. 'বটি যা দিবি তাই খায়ে থাকতে হবি। পুরা পেট দিলে পুরা পেটা, আধা পেটা দিলে আধাপেটা।'[১৮]

জাকির তালুকদারের গল্পে অধিকাংশ চরিত্র সমাজের খেটে খাওয়া, বিত্তহীন শ্রেণির প্রতিভূ। বেঁচে থাকার সামান্যতম উপাদানের জন্য নিরন্তর ছুটে চলাই তাদের নিয়তি। তাদের কাছে জীবনের আরেক নাম সংগ্রাম। গল্পে চরিত্র হিসেবে এসেছে মসজিদের মুয়াজ্জিন, দিনমজুর, ধানকাটতে

যাওয়া শ্রমিক, শ্রমজীবী নারী, সর্বহারা, বাংলা ভাই ও তার সহকর্মীরা, নক্শাল কর্মী, মসজিদের জন্য চাঁদা আদায়কারী ব্যক্তি – এরকম সমাজের অনুজ্জ্বল ব্যক্তিরা। তিনি গল্পে দেশের আদিবাসী জনগণের বঞ্চনা, তাদেরকে ভূমিহীন করার ষড়যন্ত্র এবং তাদের অন্যান্য সমস্যাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। তিনি গতানুগতিক গল্পের ধারায় শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় বা শুভবুদ্ধির উদ্রেকে কাহিনির সমাপ্তি ঘটাননি। তিনি গল্পে ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেননি, রূঢ় বাস্তবতাকে আবেগহীন দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি সমাজের গল্পহীন মানুষের পরাজয়ের গ্লানিকে নির্মোহ সত্যদ্রষ্টার দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। তিনি হাল্কা মেজাজের লেখার চেয়ে সিরিয়াস ধারার লেখায় বেশি মনোযোগী তবে *আলেকজান্ডারের পাখি* তার ব্যতিক্রমী লেখা। হাস্যরসাত্মক এই গল্পে তার লঘু রচনা ধারায় লেখার দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে চরিত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও অনেক গল্পে তিনি চরিত্রের নামকরণ করেনি। অনির্দেশক সর্বনাম ব্যবহার করে গল্পের চরিত্রদের সমাজে গুরুত্বহীন অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন। অপরদিকে গল্পে যে জটিলতা ও সমস্যাকে ফোকাস করা হয়েছে সেগুলো কোনো নির্দিষ্ট চরিত্রের নয় বরং সকলের তাই তার স্বরূপকে উপলব্ধি করানোর কৌশল হিসেবে তিনি এই স্টাইলটি ব্যবহার করেছেন। এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়— *স্বপ্নযাত্রা অথবা উদ্বাস্তুপুরাণ*, *মাতৃহন্তা*, *কন্যা ও জলকন্যা*, *একটি পুরুষতান্ত্রিক গল্প* প্রভৃতি গল্পে। আবার যেখানে একক ব্যক্তির কাহিনি বা ঘটনা এসেছে সেখানে চরিত্রের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। ঐতিহাসিক চরিত্র যেমন বাদশাহ আলমগীর, ক্লাসিক চরিত্র যেমন ম্যাক্সিক গোর্কির *মা* উপন্যাসের পাভেল ও তার মা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিক চরিত্র যেমন দ্রৌপদী, সত্যকাম, যোজনগন্ধা, বেহুলা, লখিন্দর প্রভৃতি চরিত্র ভিন্ন এক সত্য নিয়ে গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

জাকির তালুকদারের গল্পের আবেদন মগজ এবং হৃদয় উভয় স্থানে সমানভাবে ক্রিয়াশীল। তাঁর গল্পের ভাবনাগুলো পাঠকচিত্তে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, চিন্তার খোরাক যোগায়। পাঠক নতুনভাবে উপলব্ধি করে যে অতীতের তুলনায় বর্তমানে মানবসভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নয়ন ঘটলেও সমস্যা ও সঙ্কটের ক্ষেত্রগুলি দূরীভূত হয়নি বরং আরও ঘনীভূত হয়ে জটিলরূপে মানবজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। তাই তিনি অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ ঘটিয়ে সমস্যাগুলোর শেকড় সন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি সঙ্কটগুলোকে চিহ্নিত করেছেন তবে তিনি নিরাশাবাদী নন। সমস্ত নেতিবাচকতা সত্ত্বেও ইতিবাচকতা যে এখনো বিলুপ্ত হয়ে যায়নি সেই কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। *কখন যে জেগে ওঠে অচেনা গোপন* গল্পে আনিসুর রহমানের কোমল স্পর্শে পতিতা ইসমত আরার মধ্যে পেশাদারিত্বের পরিবর্তে চিরন্তন নারীত্ব জেগে ওঠে। *এখানে নয় অন্য কোনখানে* গল্পে আলমগীর হোসেন মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষয়ে যাওয়া মূল্যবোধের ধকল সহ্য করতে না পেরে শান্তি খোঁজার জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন কিন্তু এলাকার তরুণ তন্ময়ের আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। পলায়নবাদিতার পরিবর্তে প্রতিবাদ মোক্ষম অস্ত্র তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। তাই তনু হত্যার প্রতিবাদে শাহবাগের মোড়ে মুষ্টিমেয় মানববন্ধনকারীর সঙ্গে তিনিও শামিল হন। শেষ পর্যন্ত তিনি সর্বময় অন্ধকারের উপস্থিতি ও প্রতিবন্ধকতার পরেও আলোর ইশারায় আস্থাশীল হন।

জাকির তালুকদারের সাহিত্যভাবনায় দ্বিধা বা সংশয় স্থান পায়নি। তিনি সমাজ ও সময়ের অসঙ্গতিগুলো চিহ্নিত করেছেন। কারণ প্রেসক্রিপশনের আগে রোগ শনাক্ত করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ

তেমনি সমাজকে পঙ্কিলতামুক্ত শোষণহীন মানবিক স্তরে উন্নীত করতে হলে তার প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কে আগে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। আলোচ্য লেখক তা-ই করেছেন। মানুষের প্রতি ভালবাসা, মানবতায় আস্থাশীলতা মননে ও চেতনে ক্রিয়াশীল থাকায় লেখক সাহিত্যে তার বিশ্লেষণী ও শেকড়সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্যের জটিল মাধ্যম ছোটগল্প। সেই জটিল মাধ্যমকে তিনি অবলম্বন করলেন শোষিত-বঞ্চিত জনগণের পক্ষে অবস্থান নেয়ার এবং আগ্রাসী আধিপত্যবাদী ও ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য। অনেক ক্ষেত্রে গল্প বয়ানে আকর্ষণহীন নিরাবেগ বর্ণনা বা উপস্থাপনের বৈচিত্র্যহীনতা থাকলেও বিষয়বৈচিত্র্য ও সত্যভাষণে তিনি অকুতোভয়। অধিকাংশ গল্পেই তিনি সর্বদ্রষ্টার ভূমিকা নিয়েছেন। জগৎ, জীবন ও সমাজকে তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে গল্পের বিষয়কে নির্বাচন করেছেন, বর্ণনা করেছেন এবং লক্ষ্যে অটুট থেকে চূড়ান্তে উপনীত হয়েছেন। সমালোচকের ভাষায় 'ছোট গল্প কোনো ব্যাঘাত বা ক্লান্তিকে প্রশ্রয় দেয় না। তা ছিলাটান ধনুকের মতো লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হয়, পথে কোথাও থামে না।'[১৯] আলোচ্য লেখকের গল্পে সেই গতিশীলতার নিরন্তর অনুবর্তন দেখা যায়। গল্পে অল্প সংলাপ, সংলাপে ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহার, আঞ্চলিক শব্দ ও চলিত ভাষার সার্থক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। গল্পে প্রকৃতির উপস্থিতি খুবই কম লক্ষ করা যায়। তাঁর লেখায় আবেগের চেয়ে মনন বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি ছোটগল্পে কিছু নতুন অনুষঙ্গের প্রচলন ঘটিয়েছেন, বর্ণনা পদ্ধতিতে নতুন শৈলীর প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য রীতি ও প্রকরণের নামে গল্পের শরীরে আরোপিত সাজসজ্জায় আগ্রহী হননি। তিনি শুধু গল্পের সারফেস রিয়েলিটির বর্ণনাকে গুরুত্ব দেননি, গভীরে প্রবেশ করে ভিতরের সত্যকে সর্বজনীন রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন।

'প্রকৃত শিল্পী ব্যাকরণের ধার ধারেন না। নিজের জন্য নিজেই ব্যাকরণ বানিয়ে নেন।'[২০] জাকির তালুকদারের এই মতটি নিজের জন্যও প্রযোজ্য। তিনি প্রচলিত ছোটগল্পের ছকবাঁধা মসৃণ পথে অগ্রসর হননি। গল্পভাবনা ও বলার পদ্ধতিতে নিজস্ব বলয় তৈরি করে নিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পের যাত্রাপথ বন্ধুর, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ও সহযাত্রীবিহীন। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী লেখক জাকির তালুকদার সাহিত্যিক অভিযানে সিন্দাবাদের মতো সকল বৈপরীত্যকে অতিক্রম করে ছোটগল্প ধারাকে সমৃদ্ধ করছেন এবং প্রচলিত বহুচর্চিত পথের বাইরে গিয়ে নতুন পথে অগ্রসর হয়েছেন। সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও গভীর অধ্যয়ন, দৃষ্টির স্বচ্ছতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, শেকড় সন্ধানী মনন সর্বোপরি বিষয়ভাবনার অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব তাঁকে অল্প সময়ে ছোটগল্পের ভুবনে লেখক হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থানকে চিহ্নিত করেছে ।

**তথ্যসূচি:**

---

১ জাকির তালুকদার, *নির্বাচিত গল্প*, 'সোলেমান পয়গম্বরের দেয়াল', (ঢাকা: কবি প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৯), পৃ. ১১

২ প্রাগুক্ত, *মাতৃহন্তা*, পৃ. ৩৮

৩ প্রাগুক্ত, *মাতৃহন্তা*, পৃ. ৩৪

[৪] প্রাগুক্ত, *মাতৃহন্তা*, পৃ. ৩৪
[৫] প্রাগুক্ত, *মাতৃহন্তা*, পৃ. ৩৮
[৬] প্রাগুক্ত, *একটি পুরুষতান্ত্রিক গল্প*, পৃ. ৫৫
[৭] জাকির তালুকদার, *গল্পের জার্নাল*, *কন্যা ও জলকন্যা*, (ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৯), পৃ. ৬৫
[৮] প্রাগুক্ত, *নির্বচিত গল্প*, *পণ্যায়ণের ইতিকথা*, পৃ. ১২২
[৯] প্রাগুক্ত, *দিনযাপন কিংবা মৃতসুন্দরীর গল্প*, পৃ. ১০৪
[১০] প্রাগুক্ত, *মনকুসুমকাহিনী*, পৃ. ১৮৩
[১১] প্রাগুক্ত, *পুরুষ*, পৃ. ১৫১
[১২] প্রাগুক্ত, *গল্পের জার্নাল*, পৃ. ১০
[১৩] প্রাগুক্ত, *পুরুষ*, পৃ. ১৪৬
[১৪] প্রাগুক্ত, *মাতৃহন্তা*, পৃ. ৩৮
[১৫] জাকির তালুকদার, *বেহুলার দ্বিতীয় বাসর*, *বেহুলার দ্বিতীয় বাসর*, (ঢাকা: আদিত্য অনীক প্রকাশনী, আগস্ট ২০১৭), পৃ. ১৪
[১৬] প্রাগুক্ত, *নির্বচিত গল্প*, *শত্রু সম্পত্তি*, পৃ. ১৮৬
[১৭] জাকির তালুকদার, *গল্পসমগ্র ২*, *গোরস্তানে জ্যোৎস্না*, (ঢাকা: পুথিনিলয়, ফেব্রুয়ারি ২০২০), পৃ. ১২৯
[১৮] প্রাগুক্ত, *দিনযাপন কিংবা মৃতসুন্দরীর গল্প*, পৃ. ১০৯
[১৯] অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা* (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০১৬) পৃ. ১০
[২০] জাকির তালুকদার, *গল্পপাঠ*, *রবীন্দ্রনাথের অতিথি: ছোটগল্পের ব্যাকরণ*, (ঢাকা: পুথিনিলয়, ফেব্রুয়ারি ২০১৯), পৃ. ১৮